ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, ১৪৩২/২০২৫, ১২৩-১৪০
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4307

১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধনী) : একটি পর্যালোচনা

মো: মহিউদ্দিন
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: The Bengal Tenancy Act of 1928 is one of the tenancy act that regulated the relationship between landlords and tenants. This act was an important addition to the system of land ownership and the transfer rights of raiyats. Although previous tenancy acts had limitations regarding the criteria for determining the rights and responsibilities of landlords and raiyats, this act attempted to mitigate those shortcomings to a large extent. The act specifically addressed the transformation of land ownership, the process of obtaining raiyati rights, the regulation of rent increases, the renunciation of land possession, the abolition of additional taxes, and the legal benefits granted to raiyats. It also outlined several duties of the raiyats. The enactment of this law exposed existing political class divisions. Hindu and Muslim leaders, along with members of the Swaraj Party, engaged in fierce debates in the legislative assembly and proposed numerous amendments. The act was finally approved through various additions and deletions, based on recommendations that emerged from arguments, discussions, debates, and criticisms within the legislature. This article analyzes the historical context of the Bengal Tenancy Act, the socio-economic condition of the raiyats, the legislative debates, as well as the features, significance, reactions, and limitations of the Bengal Tenancy Act of 1928.

Key Words: Raiyats, Landlords, Ownership, Rent, Record of Rights, Bargadar.

জমিদার ও রায়তের সম্পর্ক নির্ধারণে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। রায়তের ভূমির মালিকানা লাভ ও হস্তান্তরে এ আইনটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বিগত প্রজাস্বত্ব আইনগুলোতে জমিদার ও রায়তের অধিকার-দায়িত্ব নির্ধারণের মাপকাঠির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও এই আইনের সংশোধনীতে সেসবের দুর্বলতা অনেকাংশে লাঘবের চেষ্টা করা হয়। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করে যা ঐতিহাসিকভাবে 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (সংশোধনী), ১৯২৮' নামে পরিচিত। বিদ্যমান প্রজাস্বত্ব আইনগুলোর সীমাবদ্ধতার দরুন জমিদারের সাথে রায়তের দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীর আবশ্যিকতা অনুভূত হয়। এই আইনে জমির হাতবদল, রায়তের অধিকার প্রাপ্তি, জমির খাজনা বৃদ্ধি নির্দিষ্টকরণ, দখলিস্বত্ব থেকে পরিত্যাগ, অতিরিক্ত কর আদায় রহিতকরণ এবং রায়তের আইনগত সুবিধা প্রাপ্তির

ন্যায় প্রভৃতি বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জমিদারের দ্বন্দ্বের পাশাপাশি ব্রিটিশ সরকারের রায়ত-প্রজার স্বার্থে গৃহীত নীতিগুলোর অস্পষ্টতা ও অকার্যকারিতার ফলে এ সংশোধনী প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। একদিকে ভূমিতে রায়তের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করা অন্যদিকে ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলন, অসন্তোষ প্রশমনের লক্ষ্যে ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রবন্ধে ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, রায়তের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আইনসভার বিতর্ক, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, প্রতিক্রিয়া ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা কর্মটিতে Qualitative Method বা গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করে গবেষণার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের নিরিখে মূল্যায়ন করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পদ্ধতির অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত বিভিন্ন উৎসের যথার্থতা বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ সমালোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে *Bengal Legisletive Council Proceedings, The Culcutta Gazettee,* বিভিন্ন পত্রিকা (যেমন: *ঢাকা প্রকাশ*, *ছোলতান*, *সওগাত*, *স্টেটসম্যান*, *অমৃতবাজার*, *প্রবাসী* প্রভৃতি), *জেলা গেজেটিয়ার*, *Census of India 1921*, W.W. Hunter-এর *A Statistical Account of Bengal* প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। পাশাপাশি এই গবেষণায় দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, জার্নাল, পিএইচডি ও এমফিল অভিসন্দর্ভ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

এ পর্যন্ত ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়নি। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু তথ্য বিভিন্ন গ্রন্থে থাকলেও তা অপর্যাপ্ত। আলোচনার প্রসঙ্গক্রমে প্রজাস্বত্ব আইনের অবতারণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কলকাতার কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী থেকে পার্থ চ্যাটার্জীর প্রকাশিত *Bengal 1920-1947, V. I* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটিতে প্রজাস্বত্ব বিলের ওপর হিন্দু-মুসলমান সদস্যদের নানা বিতর্ক ও সুপারিশ আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের *বাংলার আর্থিক ইতিহাস বিংশ শতাব্দী*, (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯০) গ্রন্থটিতে এই আইনের প্রেক্ষাপট তৈরিতে ঔপনিবেশিক সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়েছে। অনিল চন্দ্র ব্যানার্জীর *The Agrarian System of Bengal 1793-1955* গ্রন্থে ১৯২৮-১৯৪০ সালে কৃষির অবস্থা বর্ণনায় ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের প্রেক্ষাপট, আইনসভায় বিতর্ক, বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। এছাড়া মো. মোফাখখারুল ইসলামের *Bengal Agriculture 1920-1946: A Quantitative Study* এবং *An Economic History of Bengal 1757-1947* গ্রন্থদ্বয়ে প্রজাস্বত্ব আইন বিষয়ে অল্প বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের প্রেক্ষাপট বিনির্মাণে তিনটি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমত, তৎকালীন কৃষক-রায়তের আর্থসামাজিক অবস্থার চিত্র বিশ্লেষণ;

দ্বিতীয়ত, কৃষক-প্রজা বনাম ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণির দ্বন্দ্ব; তৃতীয়ত, কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক গৃহীত নানা উদ্যোগ। ১৭৬৫-১৭৯৩ সাল অবধি কোম্পানি সরকার বাংলা ভূমি রাজস্বের ওপর নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে। তাদের লক্ষ্য ছিল ভূমি রাজস্বের সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিতকরণ। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো এ লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করে। কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে ভূমিতে অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণি তৈরি হয়। অনুপস্থিত জমিদার সৃষ্টি হওয়ায় বহু স্তরে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি গড়ে ওঠে। সরকারি এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাখরগঞ্জের অধিকাংশ, ফরিদপুরের তিন-চতুর্থাংশ এবং ময়মনসিংহের এক-অষ্টমাংশ ছিল অনুপস্থিত জমিদার।[১] পাবনায় ১৯২৬ সালে এরকম অনুপস্থিত জমিদারির সংখ্যা ছিল ১৭টি যার অধিকাংশেরই আবস্থান ছিল প্রধান শহরগুলোতে। যেমন, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলকাতা, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঢাকা, বীরেন্দ্রকুমার রায়ের রাজশাহী, মনীন্দ্রনাথ নন্দীর কাসিমবাজার, হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর টাঙ্গাইল, হেরম্বনাথ চৌধুরীর আমবাড়িয়া, সতীশচন্দ্র চৌধুরীর নাগপুরে নিবাস ছিল।[২] তারা প্রত্যেকেই নিজ জমিদারি পাবনাতে অবস্থান করতেন না। বাংলার জমিদারদের এরূপ অবস্থানের ফলে তারা ভূমি ও রায়তের উন্নয়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। রায়তের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে চিত্র পাওয়া যায়,

> সে সময়ে জমিদার ও রায়তি প্রজাদের সম্পর্ক এমন যে জমিদার ছিলো চরম ক্ষমতার অধিকারী আর রায়তরা ছিলো তাদের দাস প্রজা। এক কথায় বললে রায়তরা ছিলো জমিদারদের কেনা দাস। যদি জমিদাররা দয়ালু দাতা হতেন রায়তদের মঙ্গল হতো আর যদি জমিদাররা হতেন উৎপীড়ক, রায়তরা ছিলেন প্রকৃত অসহায় রায়তদের সব ধরনের বিরোধের সমাধান দিতেন জমিদারেরা।[৩]

বাংলার কৃষক ও রায়ত শ্রেণি মহাজন, কারবারিদের নিকট থেকে চড়া হার সুদে ঋণ নিত। অবশ্য তারা অনন্যোপায় হয়েই বেশি হারে ঋণ গ্রহণ করত। তাছাড়া মহাজনরা ছিল গ্রামীণ ঋণকর্তা এবং এ ঋণ পাওয়া যেত অত্যন্ত সহজলভ্যভাবে। কিন্তু সেটি হাতের নাগালে প্রতুলতা থাকলেও সুদ ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ঔপনিবেশিক সরকার মহাজনি ব্যাবসাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানা আইন করলেও তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। যেমন, ১৯১৮ সালে Ussurious Loan Act of 1918 আইন প্রবর্তন করা হলেও মহাজনি সুদের হার হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। মহাজনি সুদের হারের একটি চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো

District	Money-lenders Usual rates prevalent in the districts percent per annum
Jessore	$18\frac{1}{2}$ to 75
Khulna	25 to $37\frac{1}{2}$
Dacca	12 to 192
Mymensingh	24 to 225
Bakarganj	24 to 100

Faridpur	15 to 150
Chittagong	15 to 75
Noakhali	24 to 78
Rangpur	$37\frac{1}{2}$ to $66\frac{1}{2}$

উৎস: *Report of the Bengal Provincial Banking Enquiry Committee 1929-30*, V.1, (Calcutte: Bengal Government Press, 1930), 198.

এছাড়া জমির জামানতের ওপর কৃষকদের প্রদত্ত ঋণের সুদ সাধারণত বার্ষিক ১৮৩/৪ শতাংশ থেকে ৩৭১/২ শতাংশ পর্যন্ত ছিল। জামানত ছাড়া প্রদত্ত ঋণের সুদ অনেক বেশি ছিল, কখনও কখনো বছরে ৩০০ শতাংশ পর্যন্ত।[৪] ঋণের জালে কৃষক যে জর্জরিত ছিল সে প্রসঙ্গে সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,

> গ্রামাঞ্চলে মহাজনেরা ঋণের কারবার করে চলেছিলেন। হিন্দু সাহা, সুবর্ণ বণিক ও গন্ধ বণিক সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণত এই মহাজনী কারবার করতেন। সাধারণত দুটি কারণে গ্রামের কৃষক মহাজনের দ্বারস্থ হত। প্রথমত, এদের কাছ থেকে খুব সহজে ঋণ পাওয়া যেত এবং ঋণের টাকা যে কোন কাজে ব্যবহার করার বাধা ছিল না। দ্বিতীয়ত, মহাজনেরা ছিলেন গ্রামবাংলার নেতা। এদের কাছ থেকে ঋণ নিলে অন্য অনেক ব্যাপারে সুবিধা পাওয়া যেত।[৫]

ঋণের সুদের হার বেশির পাশাপাশি খাজনার পরিমাণও বেশি ছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে বিভিন্ন জেলার গড় খাজনার হার পর্যালোচনা করলে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

বিশ শতকের গোড়ায় বাংলার বিভিন্ন জেলায় গড় খাজনার হার

জেলা	**খাজনা (উৎপাদনের)**
২৪ পরগনা	১০ শতাংশ
নদীয়া	০৭ শতাংশ
মেদিনীপুর	৮ শতাংশ
হুগলী	১৪ শতাংশ
বীরভূম	১৫ শতাংশ
বাখরগঞ্জ	০৯ শতাংশ
নোয়াখালী	০৯ শতাংশ
ত্রিপুরা	০৯ শতাংশ
রাজশাহী	১৩ শতাংশ

উৎস: রমেশচন্দ্র দত্ত, *দ্য ইকোনোমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ২য় খণ্ড, ৩৩৬।

এছাড়া ১৯২১ সালে কৃষি কাজের শ্রেণিবিভাজন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পূর্ব বাংলার যশোর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার ভূস্বামী গড়ে ৫ শতাংশের অধিক ছিল না। এসব জেলার অধিকাংশই ছিল প্রজা (৮০ শতাংশের অধিক) এবং বাকি কৃষি শ্রমিক কাজে নিয়োজিত। পরিসংখ্যানে স্পষ্ট যে এ স্বল্পসংখ্যক ভূস্বামী শ্রেণির হাতেই সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজার ভাগ্য নির্ধারিত হতো। নিচে পূর্ব বাংলার প্রধান জেলাগুলোর তুলনামূলক কৃষিতে নিয়োজিত শ্রেণিবিভাজন তুলে ধরা হলো–

Classification of agricultural work force by Tenancy Categories, 1921 (percentages)

	Landlords	Tenants	Labourers
Jessore	6.94	85.34	7.72
Khulna	5.73	85.68	8.59
Dacca	5.08	89.24	5.68
Mymensingh	2.49	92.12	5.39
Faridpur	6.61	88.84	4.55
Bakarganj	4.26	87.75	7.99
Chittagong	9.55	72.53	17.92
Noakhali	3.36	82.50	14.14
Rajshahi	4.60	84.18	11.22
Dinajpor	1.00	87.28	11.72
Rangpur	1.37	91.68	6.95
Bogra	1.99	89.24	8.77
Pabna	4.12	88.28	7.60

উৎস: *Census of India*, 1921, vol. 5 (Bengal), part ii, tables 2, 3, 4, 5.

Partha Chatterjee, *Bengal 1920-1947*, V. I, Calcutta: K P Bagchi & Company, 1984, 37.

কৃষকের এরূপ আর্থসামাজিক অবস্থার পাশাপাশি এ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রজা অসন্তোষ আরও একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। কৃষকবিদ্রোহের কারণগুলোর প্রকৃতি অনুসারে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা– (১) কৃষকদের খাজনা ও অধিকারসংক্রান্ত নীতি বা প্রথা লঙ্ঘন; (২) প্রচলিত খাজনার হার অগ্রাহ্য করে যুক্তিহীনভাবে খাজনার হার বৃদ্ধিকরণ; এবং (৩) কৃষিশ্রম শোষণ।[৬] বিশ শতকের গোড়া থেকে কৃষকের খাজনা সংক্রান্ত নীতি, খাজনার হার বৃদ্ধি এবং শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার কৃষক-রায়ত শ্রেণি প্রতিবাদ জানায়। পাশাপাশি কৃষকদের স্বার্থে বিভিন্ন প্রজা সম্মেলন ও সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯২৪ সালে ঢাকায় শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক প্রজা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৬ সালে মানিকগঞ্জের ঘিওর হাটে আয়োজিত হয় বিরাট প্রজা সম্মেলন। পাবনা, টাঙ্গাইল ও ঢাকা থেকে হাজার হাজার কৃষক এ সম্মেলনে যোগ দেন।[৭] এ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রায়ত-কৃষক বনাম ঔপনিবেশিক শাসকদের (জমিদার, মহাজন, জোতদার প্রভৃতি) শ্রেণির সাথে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয়। অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জমিদার-রায়ত সম্পর্ক অবনতি ঘটে। এ সময়ে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, পাবনা, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে নমঃশূদ্র হিন্দু প্রজা ও মুসলমান প্রজারা মহাজন, জোতদার, জমিদারদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও অধিকারের প্রশ্নে এ সংঘাত দেখা যায়। যেমন, ১৯২৬ সালে পাবনায় হিন্দু জোতদার ও মুসলমান বর্গাদার চাষিদের মধ্যে সংঘাত শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নেয়।[৮] ১৯২৭ সালে বরিশালের ফুলকাঠিতে কৃষকদের একটি মিছিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ব্লান্ডির আদেশে

পুলিশ গুলি বর্ষণ করে।[৯] পাশাপাশি জমিদার-প্রজা দ্বন্দ্ব ছিল আরেকটি বড় চিত্র। বিশেষ করে মুসলিম প্রজার সাথে কৃষি ক্ষমতার কাঠামোয় হিন্দু জমিদার, মহাজনদের সাথে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল তৎকালীন মানিকগঞ্জে। ১৯২৮ সালে ঢাকার মানিকগঞ্জের মুসলমান ও নমঃশূদ্র বর্গাচাষিরা হিন্দু মহাজনি ব্যবসায়ী সাহাদের ভূমি চাষ করতে অপারগতা প্রকাশ করে। *ছোলতান* পত্রিকা একে শ্রেণিযুদ্ধ বলে উল্লেখ করে। তৎকালীন খেলাফত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা শামসুদ্দিন সাহেব ঘটনা তদন্ত করে বলেন যে বিবাদ খুব ঘোরতর বটে, কিন্তু তা হিন্দু মুসলিম বিরোধ নয়। দরিদ্র হিন্দু মুসলমান কৃষক ধনী সাহা মহাজনদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তাদের বয়কট করেছে।[১০] এ সম্পর্কে আরও বলা হয়,

> সুদখোর ধনী মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার অবিচার ও নির্যাতনে বাঙ্গালার দরিদ্র, নিরক্ষর ও অজ্ঞ হিন্দু-মোছলমানগণ দিন দিন যে কিরূপ ঋণগ্রস্ত নিঃস্ব ও মনুষ্যহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। নররক্তসেবী সুদখোর মহাজন ও প্রবলপ্রতাপ জমিদারদের অত্যাচারে বাঙ্গালার কৃষককুল ও প্রজাসাধারণ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন গঠনের ভিত্তিমূল একেবারে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ফলে দেশোন্নতির কামনাও সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে। দেশের প্রাণস্বরূপ শিল্পী ও কৃষককুলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে বাঙ্গালীর রক্ষা নাই। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা। কিছুদিন হইল মানিকগঞ্জের মোছলমান কৃষকগণ তত্রত্য সুদখোর সাহা শ্রেণীর মহাজনদের ধ্বংসকর সুদের দায় হইতে মুক্ত হইয়া আত্মোপলব্ধির সাধু চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছে দেখিয়া ধনী ও শক্তিশালী মহাজনগণ তাহাদিগকে জেরবার করিবার জন্য সর্ব্ব প্রকারের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে এবং এই ব্যাপারটিকে হিন্দু-মোছলমানের বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা পাইতেছে।[১১]

এ প্রজাস্বত্ব আইনটি প্রণয়নের আরেকটি প্রেক্ষাপট ছিল পূর্বের প্রণীত বিদ্যমান খাজনা আইনগুলোর ত্রুটি ও অসামঞ্জস্যতা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর বাংলার কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষক অসন্তোষ লাঘবের নিমিত্তে ঔপনিবেশিক সরকার জমিদার-রায়তের স্বার্থে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে। বিশেষ করে ১৮৫৯ সালের দশম খাজনা আইন, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এসব আইন, বিধি-বিধান প্রজার অনুকূলে কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে দখলি রায়তের অধিকার সুনিশ্চিত করার চেষ্টা ছিল কিন্তু কীভাবে রায়ত তার অধিকার প্রমাণ করবেন বা কেমন করে সহজভাবে তা করা সম্ভব সে সম্পর্কে আইন প্রণেতাদের স্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল।[১২] তাছাড়া ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে স্থায়ী রায়ত ও অদখলি রায়তের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করলেও বর্গাদার, অধীন রায়তের স্বার্থে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ভূমিহীন খেতমজুর ও শ্রমিকদের ব্যাপারেও তেমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। রায়ত যে জমি হাতবদলের সুযোগ পেয়েছিল সত্যিকার অর্থে তারা স্বাধীনভাবে জমি হস্তান্তর করতে পারতো না। এই আইনের 'আবওয়াব' বা 'অতিরিক্ত কর' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও তা বাস্তবে বহাল ছিল। ১৮৯৭ ও ১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষে প্রজাদের রক্ষায় কোনো পদক্ষেপ ঔপনিবেশিক সরকার তথা জমিদার, জোতদার, মহাজন কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ফলে জমিদার রায়তের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটে। এছাড়া ১৯১২ সালে কলকাতা হাইকোর্ট এ আইনের

সমালোচনা করে বলে, এই আইনে প্রজাস্বত্ব জোত হস্তান্তর সম্পর্কে এমন কতগুলো ত্রুটি রয়েছে যা কার্যে পরিণত করা শক্ত। আইনের পরিবর্তন আবশ্যক।[১৩] ১৯১৯ সালে এ আইনের সংশোধনী আনা হলেও তা কৃষক-রায়তের কল্যাণে অকার্যকর ছিল। অর্থাৎ কৃষির উন্নয়নকল্পে ও রায়তের অধিকার রক্ষার স্বার্থে এসব আইন জোরালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। এই প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকেই ঔপনিবেশিক সরকার প্রজা-জমিদার দ্বন্দ্ব নিরসনে ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী আনয়ন করে।

১৯২৭ সালে কৃষি কমিশন রিপোর্ট নিয়ে নানা সমালোচনা-আলোচনা প্রতীয়মান হয়। অনেকে এই কমিশনকে নিছক অর্থ নষ্ট ছাড়া কিছুই বলেননি। ভারতীয় উপমহাদেশের কৃষির উন্নতি বিধানে এ কমিশন গঠন করা হলেও তার অসারতা পরিলক্ষিত হয়। সাত সদস্য বিশিষ্ট এ রাজকীয় কমিশন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে নানা অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্য দিয়ে রিপোর্ট পেশ করে। এ রিপোর্ট সম্পর্কে বলা হয়,

> কিন্তু কথা এই যে, যে উদ্দেশ্য লইয়া এই কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, যে উদ্দেশ্যে ভারত সরকার দরিদ্র ভারতবাসীর এতগুলি টাকা ব্যয় করিলেন, এই কমিশনের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে কি না। কমিশনের রিপোর্টে বহু ভাল ভাল কথা আছে– সেগুলি এত ভাল কথা যে, ঐ সমস্ত কথা বলিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সেগুলি এত জাজ্বল্যমান মোটা সত্য কথা যে, ঐ সমস্ত সত্য ও তথ্য আবিষ্কারের জন্য সাত সাত জন পণ্ডিত লোকের পৃথিবীময় ছুটাছুটি করিবার কোনও দরকার ছিল না।...কিন্তু আসল কথা এই যে, কৃষকদের উন্নতির জন্য আমলাতন্ত্রের মোটে মাথাব্যথা নাই। কৃষকদের সত্যিকার কল্যাণই যদি ইহাদের উদ্দেশ্য হইত, তবে যে-সরকার একটা কমিশনের পিছনে চৌদ্দ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে পারেন, সেই সরকার দেশবাসীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যাপারে টাকা খরচ করিতে কৃপণতা করিতেন না, পল্লীগঠনের কোনও প্রস্তাবেই একটি কপর্দক ব্যয় করিতে অসম্মত হইতেন না, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের আন্দোলনে এমন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেন না।[১৪]

বাংলার কৃষক, রায়ত শ্রেণি তাদের প্রতিনিধি হিসেবে জমিদারদের নির্বাচিত করে। কিন্তু এই জমিদার, মহাজন শ্রেণি নিজ নিজ স্বার্থে আইন প্রণয়ন, সংশোধন করতেন, সেক্ষেত্রে রায়তের কোনো স্বার্থ জড়িত ছিল না। জমিদারদের এ দ্বিচারিতা লক্ষণীয় মৌ: রফিক উদ্দিন আহমদ বি. এল. এর 'বাঙ্গালার প্রজাস্বত্ব আইন ও স্বরাজ্যদলের কীর্তি' শিরোনামের লেখায়,

> বাঙ্গালার প্রজা এত বোকা যে, তাহারা জমিদারকে তাহাদের প্রতিনিধি করিয়াছে। কেহ বা খাতেরে, কেহ বা অর্থলোভে, কেহ বা ভয়ে জমিদারকে ভোট দিয়াছে। ফলে জমিদারগণ তাহাদের গলায় ছুরি দিয়াছে। জমিদারগণ তাহাদের নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজার বিরুদ্ধে ভোট দিয়া প্রজার পদের লৌহশৃঙ্খল আরও আঁটিয়া দিয়াছে।[১৫]

বিদ্যমান বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের লক্ষ্যে ১৯২১ সালে ভীষ্মদেব দাস একটি কমিটি প্রণয়নের প্রস্তাব দেন। বাংলা সরকার প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের প্রয়োজন আছে কি না তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার জন্য ১৯২১ সনে স্যার জন কারের (Sir John Kerr) নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন।[১৬] বিশেষ কমিটি ৪৩টি

অধিবেশনে মিলিত হয় এবং একটি বিল প্রস্তুত করে। জনগণের অভিমত গ্রহণের লক্ষ্যে বিলটি প্রচার করা হয়। ১৯২৩ সালে কমিটি রিপোর্ট প্রণয়ন করে এবং তা জনসাধারণের আলোচনার স্বার্থে প্রচারিত হয়। রিপোর্ট সম্পর্কে পার্থ চ্যাটার্জী বলেন,

> John Kerr's Committee of 1923 had decided on the principle that produce-paying cultivators who supplied their own seeds and cattle and themselves chose their crops should be treated as tenants. John Kerr's recommendations, however, created a great stir 'among the Jotdars and other middle class tenure holders who thought that the Committee wanted to give the status of tenants to persons who did not possess it.[১৭]

অর্থাৎ জন কারের কমিটি যেসব প্রজা নিজেরাই বীজ, গবাদি পশু সরবরাহ এবং ফসল বেছে নিতেন, তাদের প্রজা হিসেবে গণ্যের সুপারিশ করেছিল। তবে, জন কারের সুপারিশগুলো জোতদার এবং অন্যান্য মধ্যবিত্ত জমিদারদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, যারা মনে করেছিল যে কমিটি এমন ব্যক্তিদের প্রজা হিসেবে মর্যাদা দিতে চায় যাদের জমির মালিকানা নেই। অর্থাৎ বর্গাদারদের রায়তি অধিকারের সুপারিশ নিয়ে প্রবল আলোচনা, সমালোচনা তৈরি হয়। এরপর জন কারের বিলটি সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে সিলেক্ট কমিটির সদস্য নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল পেশ করেন। এ বিলে প্রজাস্বত্ব যদি ঋণের দায়ে মহাজনের হস্তগত হয়, তাহলে জমিতে কোর্ফা প্রজা অর্থাৎ প্রকৃত চাষির দখলে থাকবে এরূপ বিধানের বিরোধিতা করা হয়। কোর্ফা প্রজার এ অধিকারের ব্যাপারে সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ সদস্য অসম্মতি জানায়। তারা সুপারিশ করে এ পরিস্থিতিতে প্রজার স্বত্ব জমিদার, মহাজন বা মধ্যস্বত্বভোগীর নিকট অর্পিত হবে। অবশ্য সরকার এ নীতির বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করে কেননা এটি ছিল কৃষকদের জন্য অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর এবং বাংলার কৃষক শ্রেণির প্রতিকূল।[১৮] প্রজাস্বত্ব বিলটি বাংলার কৃষি ও কৃষকের সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত বিধায় ব্রিটিশ সরকার পুনরায় সমগ্র বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করে। বিলের বিধিবিধানসমূহ পুনর্বিবেচনার জন্য আরেকটি নতুন কমিটির নিকট প্রেরণ করে। এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি স্যার নলিনীরঞ্জন চ্যাটার্জী। চ্যাটার্জী কমিটি ১৯২৭ সালে সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে।[১৯] এ বিলের ওপর বিশেষ করে মিউনিসিপ্যাল এলাকা, পার্বত্য চট্টগ্রামে আইনের ব্যবহার, বর্গাদারের অধিকার, মোকররী রায়তের উচ্ছেদ, সেলামী, কোর্ফা রায়তের খাজনা বৃদ্ধি, দখলী স্বত্বহীন রায়তের অধিকার, বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রি, জমিদারের অগ্রক্রয়াধিকার প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা, বিতর্ক ও যুক্তি খণ্ডন করা হয়। পরবর্তীতে নানা সংযোজন, বিয়োজন ও সংশোধন করে ১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৯২৮ (সংশোধনী) আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল–

(ক) বিগত বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ

(খ) রায়তের অসন্তোষ হ্রাস

(গ) জমিদার-রায়তের মধ্যে সুসম্পর্ক ও কল্যাণসাধন

মূলত আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ছিল এতদিন বিদ্যমান যেসব প্রজাস্বত্ব আইন প্রচলিত ছিল সেগুলোর সংশোধন আনয়ন করে প্রজা ও জমিদারদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। এ আইন ঔপনিবেশিক সরকারের বিপরীতে রায়তের অসন্তোষ কমানোর লক্ষ্যে একটি পদক্ষেপ ছিল।

বৈশিষ্ট্য

এ আইনের ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে বেশকিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

১. প্রজার ধরন: এ আইনে প্রজাদের ৩ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা: (১) মধ্যস্বত্বাধিকারী (অধীন মধ্যস্বত্বাধিকারীও অন্তর্ভুক্ত); (২) রায়ত; এবং (৩) কোর্ফা রায়ত, অর্থাৎ যে প্রজারা সাক্ষাৎভাবে বা পরম্পরা অনুসারে রায়তের অধীনে ভূমি ভোগ করে; এবং রায়ত শ্রেণিকে আবার কয়েকটি শ্রেণিবিভাজন করা হয়েছে– (ক) মোকররী রায়ত: যারা চিরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তিত খাজনায় ভূমি ভোগ করে; (খ) দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রায়ত: যে রায়তের ভূমিতে দখলিস্বত্ব আছে; এবং (গ) দখলিস্বত্বশূন্য রায়ত: যে রায়তের ভোগকৃত জমিতে দখলিস্বত্ব নাই।[২০] বেঙ্গল ল্যান্ড রেভিন্যু কমিশনের রিপোর্টে রায়তের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বলা হয়,

> It divided them into three classes. Under-raiyats who had already obtained rights of occupancy by custom were given the full rights of occupancy raiyats, except transferability and the right to be deemed protected interests against the superior landlord of the raiyat. The second class consisted of under raiyats who had a homestead on their land, or had occupied it for 12 years continuously, or had been admitted in a document by their landlords to have a permanent and heritable right. This class could be ejected if they failed to pay their rent, or if they misused the land. The third class of under raiyats could also be ejected on the additional ground that the raiyat wanted the land for his own cultivation.[২১]

২. খাজনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলা হয় খাজনা একবার বৃদ্ধি ১৫ বছরের মধ্যে করলে, তা আর বৃদ্ধি করা যাবে না। এছাড়া বলা হয়, রায়তের ওপর কষ্ট লাঘবের নিমিত্তে আদালত দশ বছরের অনধিক সময়ব্যাপী ক্রমান্বয়ে খাজনা অল্প অল্প করে বৃদ্ধি করতে পারবে। জমিদার জমির উন্নতি সাধন, ফসলের গড় দাম বৃদ্ধি, নদীর স্রোতের ক্রিয়াজনিত উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির (উর্বরতা বৃদ্ধি) কারণে ভূমির খাজনা বৃদ্ধি করার বিধান ধার্য করা হয়। অনুরূপভাবে ফসলের গড় দাম হ্রাস, অনুর্বর জমি (বালি জমি) এবং জমিদার চুক্তি অনুযায়ী জলসেচের ব্যবস্থা বা বাঁধ নির্মাণ না করলে রায়ত খাজনা কমানোর আবেদন করতে পারবে।

৩. এ আইনের মাধ্যমে যেসব আইন রহিত করা হয়–

বেঙ্গল কোডের রেগুলেশন

আইন ও রেগুলেশন	রহিতকরণ
১৭৯৩ সালের ৮ রেগুলেশন	৫১-৫৫ এবং ৬৪-৬৫ ধারা
১৮০৫ সালের ১২ রেগুলেশন	৭ ধারা
১৮১২ সালের ৫ রেগুলেশন	২-৪, ২৬-২৭ ধারা
১৮ রেগুলেশন	আইনের মুখবন্ধ এবং ২, ৩ ধারা
১৮২৫ সালের ১১ রেগুলেশন	৪ ধারা (I) দফায় অধীন মধ্যস্বত্বে সংলগ্ন যদি না হয় হতে উক্ত দফার শেষ পর্যন্ত

মন্ত্রিসভার আইন

১৮৬২ সালের ৬ আইন	সম্পূর্ণ
১৮৬৭ সালের ৪ আইন	সম্পূর্ণ
১৮৬৯ সালের ৮ আইন	সম্পূর্ণ
১৮৭৯ সালের ৮ আইন	সম্পূর্ণ

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গভর্নর জেনারেল প্রণীত আইন

১৮৫৯ সালের ১০ আইন	সম্পূর্ণ

উৎস: বিভূতিভূষণ মিত্র (সম্পা.), *বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (১৯২৮ সালে সংশোধিত)*, (কলকাতা: ইষ্টার্ণ ল হাউজ, ১৩৩৬), ২৩১-২৩২

৪. রায়ত জমিতে দখলিস্বত্ব লাভ করলে বৃক্ষরোপণ, ফুল, ফল ও অন্যান্য শস্যাদি ভোগ, বৃক্ষাদি কর্তন, বৃক্ষের কাঠ ও হস্তান্তরের অধিকার প্রাপ্ত হবে।[২২] এছাড়া পানীয় জলের পুকুর, ইদারা খনন, বসবাসের জন্য পাকা বাড়ি, দালান ইমারত নির্মাণের অধিকার দেওয়া হয়।

৫. রায়ত কোনো দখলিস্বত্ব বা খণ্ডিত অংশ হস্তান্তর করার অধিকার লাভ করে। এছাড়া বলা হয়, দখলিস্বত্ব রায়তের মৃত্যুর পর উত্তারাধিকারগণ জমির ওয়ারিশ প্রাপ্ত হবে।

৬. পূর্বের প্রজাস্বত্ব আইনগুলোতে ভূম্যধিকারী, মহাজন বা জোতদার ইচ্ছানুযায়ী জমি বন্ধক রাখতে পারতেন। এই আইনে ১৫ বছরের বেশি জমি বন্ধক রাখতে পারবে না বলে বিধান করা হয়। সরকারের মুখপাত্র F. A Sachse বলেন, 'It was better to provide that no *mahajan* could keep a raiyat out of his land more than 15 years at the most.'[২৩]

৭. এই আইনে বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল এবং অন্যান্য জেলার সাঁওতালরাসহ ভূঁইয়া, ভূমিজ, গারো, গন্ড, হাড়ি, হাজং, হো, খাড়িয়া, খারবার, কোচ (ঢাকা বিভাগ), কোড়া, মগ (বাকেরগঞ্জ জেলা), মাল ও সৌরিয়া পাহাড়ি, মেছ, মুন্ডা, ওঁরাও এবং টুরিদের স্বত্ব বিক্রয়, দান, পাট্টা, বন্ধক প্রভৃতির অধিকার প্রদান করা হয়।

৮. এই আইনে সকল প্রকার আবওয়াব, মাথট বা এ জাতীয় কর আদায় সম্পূর্ণরূপে আইনবিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যদি ভূম্যধিকারী কোনোরূপ অতিরিক্ত খাজনা আদায়

করে সেক্ষেত্রে ৬ মাসের মধ্যে রায়ত প্রদেয় অর্থ বা উৎপন্ন মূল্য এবং তদতিরিক্ত অনধিক দুইশত টাকা অথবা যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে সেটির দ্বিগুণ অর্থ দাবি করতে পারবে।[২৪]

৯. এ আইনে রায়তের জমি হস্তান্তরের বিষয়টি আইনানুগভাবে বন্দোবস্ত করা হয়। জমিদারকে জমির বিক্রীত মূল্যের ২০% সালামি দেওয়ার বিনিময়ে জমি হাতবদলের বিধান ধার্য করা হয়। জমিদার হকশোফা ভোগ করবেন (right of preemption) অর্থাৎ বিক্রীত জমির দাম ১০ শতাংশ বেশি দিয়ে কিনে নিতে পারবেন।[২৫]

১০. রায়ত জমির খাজনা প্রদান করলে দাখিলা ও হিসাবের বিবরণের স্বত্ব পাবেন। নিচে দাখিলার একটি নমুনা তুলে ধরা হলো–

প্রজাস্বত্ব আইন দাখিলার বিবরণ

দাখিলার বিশেষ বিবরণ (ভূম্যধিকারীর অংশ)	**দাখিলার বিশেষ বিবরণ (প্রজার অংশ)**
১। দাখিলার ক্রমিক নং	১। দাখিলার ক্রমিক নং
২। গ্রাম, পরগণা ও থানার নাম	২। গ্রাম, পরগণা ও থানার নাম
৩। (ক) এস্টেটের নাম ও তৌজির নম্বর যাহার মধ্যে ভূমি অবস্থিত এবং (খ) (যদি ভূম্যধিকারিগণ মালিক (Proprietor) না হন তবে) ভূম্যধিকারিগণের জোত বা মধ্যস্বত্বের কোন নাম থাকিলে তাহা	৩। (ক) এস্টেটের নাম ও তৌজির নম্বর যাহার মধ্যে ভূমি অবস্থিত এবং (খ) (যদি ভূম্যধিকারিগণ মালিক (Proprietor) না হন তবে) ভূম্যধিকারিগণের জোত বা মধ্যস্বত্বের কোন নাম থাকিলে তাহা
৪। ভূম্যধিকারীর নাম ও তাহাদের কিরূপ স্বত্ব তাহা	৪। ভূম্যধিকারীর নাম ও তাহাদের কিরূপ স্বত্ব তাহা
৫। প্রজার নাম	৫। প্রজার নাম
৬। জোত বা মধ্যস্বত্ব যাহার জন্য খাজনা দেওয়া হয় তাহার বিবরণ (ক) ভূম্যধিকারীর ওয়াশীলের (Rent-roll) ক্রমিক নম্বর, রেকর্ড, অব রাইটম্ প্রস্তুত হইয়া থাকিলে প্রজার স্বত্বের (tenancy) ক্রমিক নম্বর	৬। জোত বা মধ্যস্বত্ব যাহার জন্য মাজানা দেওয়া হয় তাহার বিবরণ (ক) ভূম্যধিকারীর ওয়াশীলের (Rent-roll) ক্রমিক নম্বর, রেকর্ড, অব রাইটম্ প্রস্তুত হইয়া থাকিলে প্রজার স্বত্বের (tenancy) ক্রমিক নম্বর
(খ) জমির পরিমাণ (area)	(খ) জমির পরিমাণ (area)
(গ) বার্ষিক খাজানা (নগদ অথবা উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অথবা উভয় অবস্থানুসারে)	(গ) বার্ষিক খাজানা (নগদ অথবা উৎপন্ন শস্যের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অথবা উভয় অবস্থানুসারে)
(ঘ) বার্ষিক পথকর এবং পাবলিক ওয়ার্কস্ সেস	(ঘ) বার্ষিক পথকর এবং পাবলিক ওয়ার্কস্ সেস
(ঙ) জলকর, বনকর, এবং ফলকর	৬। জলকর, বনকর, এবং ফলকর
৭। (গ), (ঘ) এবং (ঙ) বিষয়ের কোন বিষয়ে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং কোন্ সন ও কিস্তী	৭। (গ), (ঘ) এবং (ঙ) বিষয়ের কোন বিষয়ে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং কোন্ সন ও কিস্তী
৮। ওয়াশীলের তারিখ।	৮। ওয়াশীলের তারিখ।
৯। ভূম্যধিকারী বা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর-	৯। ভূম্যধিকারী বা তাহার ক্ষমতা প্রাপ্ত গোমস্তার স্বাক্ষর-

উৎস: ৫৬ নং ধারা, ২য় তফসীল, *বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (১৯২৮ সংশোধিত)*; *The Calcutta Gazette,* 12 July 1928

১১. এ আইনের অধীনে একজন নিমস্বত্ব রায়ত কোনো নির্দিষ্ট জমি ক্রমাগত বারো বছর ভোগদখল করে থাকলে প্রতিযোগিতামূলক হারে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে সেই জমির ওপর সে অধিকার লাভ করে।[২৬]

১২. এ আইনে প্রজার জোতের ফসল ক্রোক, ফসল কাটা ও সংগ্রহ, স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়াবলি অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। অন্যদিকে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব প্রজা অস্বীকার করলে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়। কেউ যদি এরূপ করে তাহলে আদালত প্রজার প্রদেয় বার্ষিক খাজনার দশগুণ ক্ষতিপূরণ অর্থ ধার্য করতে পারবেন।

প্রতিক্রিয়া

আইনসভায় আইনটি গৃহীত হওয়ার পর জমিদার, মহাজন ও জোতদার শ্রেণি ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কাউন্সিলে বিলটি উত্থাপনের সাথে সাথে ঢাকার নবাব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে পূর্ববাংলার জমিদাররা তাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে বলে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন।[২৭] ১৯২৮ সালের ১২ আগস্ট নর্থব্রুক হলে প্রজাস্বত্ব আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনের আপত্তি জানাতে পূর্ববঙ্গের অসংখ্য জমিদার সম্মেলনের আয়োজন করে। নবাব হাবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে সভায় জমিদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[২৮] পার্থ চ্যাটার্জী এ আইন সম্পর্কে বলেন,

> Safeguards have been to a certain extent provided in the Bill for the fractional protection of the interests of landlords in providing a 25 per cent transfer fee, and the preemption right of landlords, exercisable in cases of fraudulent transfers. An attempt is now being made to force the hands of the Government to do away even with these safeguards. ...the landholders humbly beg to point out that more than 4,600,000 out of 4,700,000 tenure holders, who are also regarded as landlords under the Act, are far poorer than even most of the raiyats who are not in all cases actual tillers of the soil. The inevitable effect of the Bill, if passed, will be to create a new class of middlemen from among moneylenders and other outsiders who are not likely to have sympathy or community of feeling with the actual tillers of the soil.[২৯]

অর্থাৎ, বিলটি পাশ হলে মহাজন এবং অন্যান্য বহিরাগতদের মধ্যে একটি নতুন মধ্যস্বত্ব শ্রেণি তৈরি হবে যাদের জমির প্রকৃত চাষিদের প্রতি সহানুভূতি বা সম্প্রদায়ের অনুভূতি থাকার সম্ভাবনা নেই। *স্টেটসম্যান* পত্রিকা আশঙ্কা প্রকাশ করে যে একটি স্থির নীতির এমন গুরুতর পরিবর্তনের ফলে খুব শীঘ্রই প্রজাদের সাথে অত্যন্ত অনুগত শ্রেণির (জমিদার বা মহাজন) মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে যা ভারতে সুশাসনের জন্য অবাঞ্ছিত এবং সম্ভবত একটি কৃষি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে।[৩০] *অমৃতবাজার* পত্রিকা জমিদার-প্রজার এই আপসের অনুভূতিটি নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে প্রকাশ করে, 'দুই পক্ষের মধ্যে মাঝেমাঝে দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, জমিদার এবং রায়তরা সামগ্রিকভাবে পারস্পরিক

সহানুভূতি, শান্তি এবং সাহায্যের মনোভাবের সাথে বসবাস করতে সক্ষম হয়েছে...জমিদার এবং রায়তের মধ্যে সমস্ত বিরোধ উভয় পক্ষের জন্য সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি না হওয়ার কোনো কারণ নেই।'[৩১] ১৯২৮ সালের কলকাতায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের অধিবেশনে বাংলার মুসলমানদের একটি অংশ প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী বিলের নিন্দা করে একটি রেজুলেশন গ্রহণ করেন। এ রেজুলেশন উপস্থাপন করে আজিজুল হক বলেন,

> All India Muslim League is emphatically of opinion that the provisions relating to the grant of further rights to the Landlords of Bengal in the Bengal tenancy Amendment Bill by the introduction of pre-emption and salami are extremely detrimental to the rural population in the presidency of Bengal and the League... appeals to His Excellency the Governor of Bengal for withholding his assent to the Bill till these two provisions are reconsidered by the council.[৩২]

এ প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়নে রাজনৈতিক মতভেদের চিত্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে প্রজাদের স্বার্থে মুসলিম নেতৃবর্গ সমর্থন দেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয়,

> এই আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে প্রথমবারের মতো কোনো ভূমি সংস্কার আইন প্রণয়নকালে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কৃষকরা প্রধানত মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমর্থন পেয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ভূমিস্বত্বের ওপর তাদের অধিকার বৃদ্ধিতে তাদের এই সমর্থন অব্যাহত ছিল। সুতরাং সার্বিকভাবে বলা যায় যে বিশ শতকের বিশের দশকে প্রধানত ভোট রাজনীতির কারণে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে ভূমিস্বত্বের ওপর কৃষকদের কিছু সুবিধা বৃদ্ধি এবং মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভ ভূমি বিরোধ তথা জমিদার-জোতদার-কৃষক দ্বন্দ্ব হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।[৩৩]

সীমাবদ্ধতা

১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে ভূমিস্বত্বের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভূমির ওপর কৃষকদের পূর্বের তুলনায় অধিকতর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৪] সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইনটি ছিল বাংলা কৃষি অর্থনীতিতে অন্যতম সংযোজন। কিন্তু আইনটি পাশ হওয়ার পর এর ব্যাপক সমালোচনা ও সীমাবদ্ধতা প্রকাশিত হয়। এ সংশোধনী আইনে এমন কিছু বিধান ছিল যা জমিদার ও রায়তের উভয়কেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে বেঙ্গল রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা Sir F. A Sachse বলেন,

> The bill was 'a compromise envolved with great travail'. There were provisions which did not please the big zamindars as also provisions which did not please the tenure-holders and 'substantial' ryots. But there were provisions which 'get rid of discrepant High Court rulings'- some of them recognizing the bargadars as tenants and others declining to do so. There were,

> again, provisions which, 'to a minor and insignificant extent', helped the poor cultivator who had not the fortune to be a ryot.[৩৫]

রায়তের অধিকারের কথা বলা হলেও কিছু ক্ষেত্রে রায়তের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়। 'জমির অধিকার' প্রবন্ধে শ্রী অবিনাশচন্দ্র দত্ত বলেন,

> আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় জমির অধিকারের সমস্য একটি বড় সমস্যা। বাংলা দেশে প্রজাস্বত্বের ১৯২৮ সনের সংশোধিত আইন প্রজা ও মধ্যবিত্তের অবস্থার জটিলতা দূর না করে, তাকে আরও সঙ্কটাপন্ন করে তুলেছে। এক দিকে নানা অর্থনৈতিক কারণে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের অল্পতা এবং অন্য দিকে আইনের বিধানে কৃষকের জমির মূল্যের হ্রাস জনসাধারণের আর্থিক দুর্দ্দশা বৃদ্ধি করেছে।[৩৬]

এ আইনে জমিদার, মহাজন বা জোতদারকে সেলামির পরিবর্তে জমি হস্তান্তরের যে বিষয় প্রবর্তন করা হয়েছিল তা কৃষকের স্বার্থের বিপরীতেই গিয়েছিল। প্রত্যেকবার ভূমি স্বত্বের হাতবদলের প্রাক্কালে এ সেলামি প্রদানের বিধান থাকায় কৃষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া জমির হাতবদলের ক্ষেত্রে জমিদার, জোতদারকে যে অগ্রক্রয়ের অধিকার (right of preemption) দেওয়া হয়েছিল তা ছিল জমিদারের স্বার্থে। অবশ্য খাঁ বাহাদুর একরামুল হক জমিদারদের এরূপ বিশেষ অধিকার দেওয়ার প্রয়োজন নেই বলে অভিমত দেন।[৩৭] এটির ফলে কৃষক ছিল হাত-পায়ে বাঁধা। প্রজা ইচ্ছানুযায়ী জমির স্বত্ব হাতবদল করতে অসমর্থ ছিল। ঘুরেফিরে প্রজাকে পুরাতন চক্রেই আবদ্ধ থাকতে হতো। এ প্রসঙ্গে বলা হয়,

> প্রজাকে জমি বিক্রয়ের অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু জমিদারের হাত হইতে রেহাই পাইবার তাহার উপায় নাই। কারণ জমিদারকে অগ্র ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ জমিদার ইচ্ছা করিলে জমি হস্তান্তরের দুই মাসের মধ্যে বিক্রয়মূল্যের শতকরা দশ টাকা বেশী দিয়া ঐ জমি নিজে লইতে পারিবে। আবার জমির ক্রেতার ক্রয়মূল্যের শতকরা কুড়ি টাকা জমিদারকে 'সেলামী' দিতে হইবে। ইহাতে বিক্রেতার ক্ষতিই অধিক হইবে। কারণ জমির মূল্য বাড়িতে পারিবে না। বিক্রেতা উচিত মূল্য পাইবে না। যেহেতু ক্রেতা বিক্রেতাকে জমির উচিত মূল্য দেওয়ার পূর্ব্বেই জমিদারের 'সেলামী'র টাকা বিক্রেতার উচিত প্রাপ্যের মধ্য হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা পাইবে। কেননা ক্রেতা বেচারা জমি খরিদ করিলে যদি জমিদার মেহেরবানীপূরর্ব্বক ঐ জমির উপর একবার খোশ মেজাজে নেক নজর করেন তাহা হইলে ও বেচারার আর জমি রাখিবার উপায় নাই,- হুজুরকে দিতে হইবেই। ক্রেতা হয়ত জমি আবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার এ পরিশ্রম মাঠেই মারা গেল। প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত হওয়ায় প্রজাসাধারণের উপকার বা অপকার কি পরিমাণে হইয়াছে তাহা সকলেই এখন সহজে বুঝিতে পারিবেন।[৩৮]

১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের ফলে জমিদার কর্তৃক রায়তের খাজনা বৃদ্ধির অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় জমিদার-রায়তের সম্পর্ক আরও অবনতি ঘটে। সেটেলমেন্ট কোর্টের মাধ্যমে জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে জমিদার-রায়ত বিরোধ সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত হয়।[৩৯] এছাড়া আবওয়াব বা অতিরিক্ত খাজনা

আদায়ের বিষয়টি রহিত করা হলেও জমিদার বিভিন্ন নামে-বেনামে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজার নিকট থেকে তা আদায় করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়,

> ...জমিদাররা কালেক্টরীতে মোট খাজনা দিয়া থাকে আড়াই কোটি টাকার কিছু বেশী। আর তাহারা রায়তের নিকট হইতে খাজনা বাবদ আদায় করিয়া থাকে চৌদ্দ কোটি টাকার সামান্য কম। ইহার পরেও বেআইনীভাবে নজর, সেলামী এবং বৎসরের বার মাসের তের পার্বণে চৌদ্দ দফা মাথট ও আবওয়াব আদায় করিয়া থাকে।... সরকারের পক্ষ হইতে আড়াই কোটি টাকা আদায় করিবার জন্য যাহারা চৌদ্দ কোটি টাকা আদায় করিতেছে, আইনের সাহায্যে তাহাদের আয় আরও বাড়াইয়া দিবার ন্যায়সঙ্গত কোনো কারণ ছিল না।[৪০]

ফলে দেখা যাচ্ছে কৃষক বা রায়তকে বাঁচাতে আইনের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা অনেকাংশে ম্লান হয়েছিল। এ আইনের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল বর্গাদারকে স্থায়ী রায়ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। জন কারের কমিটি, সিলেক্ট কমিটি বর্গাদারকে রায়তের মর্যাদা দেয়ার যে সুপারিশ করেছিল সেটিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বাংলার একটি বিশাল জনগোষ্ঠীকে জমির এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বর্গাদারদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মৌলভী তমিজুদ্দীন ৪ ধারা (ক) উপধারাটি আইনে তুলে দেওয়ার কথা বলেন। এ প্রস্তাবের বিপক্ষে অখিলচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, অমেরন্দ্রনাথ ঘোষ, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায় ও পক্ষে স্যার আব্দুর রহিম, খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক, নুরুল হক চৌধুরী, আছিমুদ্দিন বক্তৃতা করেন।[৪১] খাঁ বাহাদুর মৌলভী আজিজুল হক ওঠবন্দী প্রথায় যেসব রায়ত জমি রাখে তাদেরকে প্রজা বলে আখ্যায়িত করা হোক বলে মতামত দেন। অবশ্য সেটিও বাতিল হয়। নানা বিতর্ক শেষে আধি, বর্গা বা ভাগ নামে সাধারণত প্রচলিত প্রথায় উৎপন্ন শস্যের অংশ দেওয়ার শর্তে যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট জমি চাষ করে তাহলে ওই ব্যক্তি প্রজা বলিয়া গণ্য হবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৪২] এ আইনের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হলো প্রচলিত আইনের সাংঘর্ষিকতা। বিশেষ করে দখলি স্বত্ব রায়তের জমি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রির কথা বলা হয়। এ কে ফজলুল হক হিবা, ওয়াক্ফ ও ধর্ম বা দাতব্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রির বিষয়টি বাতিলের প্রস্তাব করেন। কিন্তু এ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয় কেননা আইনসভায় হিন্দু সদস্যের সংখ্যা বেশি ছিল। মুসলিম আইন ক্ষুণ্ন হয়েছে এই প্রতিবাদে এ কে ফজলুল হকসহ অন্যান্য মুসলিম সদস্যরা (স্যার এ কে গজনভী ও আলতাফ আলি ব্যতীত) ওই দিনের সভা ত্যাগ করেছিলেন।[৪৩] *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদকীয় 'প্রজাস্বত্ব আইন' শিরোনামে লিখে,

> বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত হইয়াছে।... কিন্তু সংবাদপত্র পাঠকরা অবগত আছেন, এই সংশোধিত আইন প্রজার অধিকার যাহা বাড়াইয়াছে, তাহা নাম মাত্র, আর তাহাদের অধিকার যাহা হরণ করা হইয়াছে, তাহার মূল্য অনেক বেশী।...জমি হস্তান্তরের অবাধ অধিকার দিয়া প্রজাকে খুব বড় একটা অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহার আইনগত মূল্য যতটা, বিষয়গত মূল্য ততটা নহে। কারণ জমি হস্তান্তরের আইনগত অবাধ

> অধিকার ছিল না বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেশের সর্বত্র জমিদারের অনুমতি না লইয়াই ক্রয়-বিক্রয় বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।...সুতরাং দেখা গেল, জমি হস্তান্তরের অবাধ অধিকার দিয়া রায়তের সাত পুরুষ উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া যে আস্ফালন শুনা যাইতেছে, উহা নিতান্ত বাজে কথা।[৪৪]

মৌলবী আবুল কাশেম প্রজাস্বত্ব আইনকে অসন্তোষজনক উল্লেখ করে ভূমি চাষাবাদকারীদের অবস্থা নিরাপদ হয় সেজন্য সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন, নতুবা বাংলার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে মন্তব্য করেন।[৪৫]

উপসংহার

এ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্পষ্টত হিন্দু-মুসলিম সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার দ্বন্দ্ব প্রতীয়মান হয়। বিশ শতকের শুরু থেকেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল সেটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯২০ এর দশকে খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেই দ্বন্দ্বের অবসানের সম্ভাবনা দেখা দিলেও সেটি যেন কাগজে-কলমে ও আলাপ-আলোচনার টেবিলেই রয়ে যায়। বাংলার দুই প্রধান গোষ্ঠীর নেতৃবর্গ ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইনেও সেই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কেননা হিন্দু জমিদার, মহাজন ও জোতদার শ্রেণি ছিল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য। ফলে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনীতে তারা স্বভাবতই নিজ স্বার্থের বাইরে গিয়ে কাজ করেনি। অন্যদিকে মুসলমান প্রজার প্রতিনিধি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। তাই জমিদার শ্রেণির স্বার্থবিরোধী কোনো আইন আইনসভায় গৃহীত হয়নি, যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় রায়তের স্বার্থে কোনো আইন পাশ করা দুঃসাধ্য ছিল। তবে রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক স্বার্থের সংঘাত থাকলেও জমিদার, মহাজন বা জোতদারের সাথে প্রজার দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে এ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন অন্যতম ভূমিকা পালন করে। ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইনটি কাগজে-কলমে রাজনৈতিক দলিল হলেও তা প্রকৃত অর্থে রায়তের অধিকার বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। এ আইনকে কেন্দ্র করে তৎকালে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের যে রাজনীতি দেখা যায় তা পরবর্তীকালেও পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার রায়ত ও জমিদারের মধ্যকার দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল তা স্পষ্টত সফলতার মুখ দেখেনি যেটির দরুন পরবর্তীতে প্রজাস্বত্ব (১৯৩৮) আইনের আরেকটি সংশোধনী অনিবার্য হয়েছিল।

তথ্যসূত্র

১ W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. V, (Delhi: 1973), 214, 333, 458.

২ রাধারমন সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ৩ খণ্ড, (কলকাতা: পুস্তক বিপণী, ১৩৩৩), ২৬৮।

৩ আবদুল বাছির, *বাংলার কৃষক বিদ্রোহ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২), ৫৪।

৪ M. Mufakharul Islam, *Bengal Agriculture 1920-1946: A quantitative study*, (Cambridge: Cambridge Uiversity Press, 1978), 158.

৫ সুবোধ কুমার, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস বিংশ শতাব্দী*, (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯১), ১৫।
৬ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম খণ্ড, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৩), ২১৯।
৭ মোহাম্মদ আবদুল বাতেন চৌধুরী, 'হাশেম আলী খানের জীবন ও রাজনীতি: ১৯১৪-১৯৩৬', (*ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩), ৯০, DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4107.
৮ সুমিত সরকার, *আধুনিক ভারত: ১৮৮৫-১৯৪৭*, (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৩), ২৩।
৯ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ২২০।
১০ *ছোলতান*, ৮ম বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা : ২৪ ফাল্গুন ১৩৩০।
১১ *ছোলতান*, ৮ম বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা : ২৫ মাঘ ১৩৩০।
১২ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী)*, (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৮৭), ১৯।
১৩ *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮।
১৪ *সওগাত*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা; শ্রাবণ, ১৩৩৫।
১৫ *শরিয়তে এসলাম*, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা; আশ্বিন, ১৩৩৫।
১৬ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস বিংশ শতাব্দী*, (কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯০), ৪৯।
১৭ Partha Chatterjee, *Bengal 1920-1947,* V. I, (Calcutta: K P Bagchi & Company, 1984), 1.
১৮ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮ জুলাই ১৯২৬।
১৯ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ৪৯।
২০ বিভূতিভূষণ মিত্র (সম্পা.), *বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (১৯২৮ সালে সংশোধিত)*, (কলকাতা: ইষ্টার্ণ ল হাউজ, ১৩৩৬), ৮-৯।
২১ *Government of Bengal Report of the Land Revenue Commission Bengal,* Vol. I, (Alipore: Superintendent, Government Printing Bengal Government Press, 1940), 30.
২২ অবিনাশ চন্দ্র সরকার ও কৈলাসচন্দ্র আচার্য্য (সম্পা.), *বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত)*, (ঢাকা: মডেল লাইব্রেরি, ১৯২৯), ২৫।
২৩ Anil Chandra Banerjee, *The Agrarian System of Bengal 1793-1955,* v.2, (Calcutta: K P Bagchi & Company, 1981), 312.
২৪ বিভূতিভূষণ মিত্র (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ৯২।
২৫ সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস বিংশ শতাব্দী*, প্রাগুক্ত, ৫০।
২৬ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৮, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১১), ২৬৪।
২৭ *The Statesman,* 8 August 1928.
২৮ *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ আগস্ট ১৯২৮।

২৯ Partha Chatterjee, *Bengal 1920-1947,* V. I, (Calcutta : K P Bagchi & Company, 1984), 4.
৩০ *The Statesman,* ১৬ আগস্ট ১৯২৮।
৩১ *অমৃতবাজার* পত্রিকা, ১০ আগস্ট ১৯২৮।
৩২ *The Mussalman,* 1 January 1929। বিস্তারিত মো. রফিকুল ইসলাম, *বাংলায় মুসলিম রাজনীতি: ১৯২৩-১৯৪৭*, পিএইচডি থিসিস, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস বিভাগ, ২০১৬), ১৭১।
৩৩ এস. এম. রেজাউল করিম, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভূমি বিরোধের রাজনীতি, ১৮৮৫-১৯৭১*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাস বিভাগ, ২০২১), ৩৪-৩৫।
৩৪ এস. এম. রেজাউল করিম, *ভূমি বিরোধের রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২৫), ৪১।
৩৫ Anil Chandra Banerjee, *Ibid,* 312.
৩৬ *প্রবাসী*, ৩৩শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪০।
৩৭ *ঢাকা প্রকাশ*, ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮।
৩৮ *মোয়াজ্জিন*, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; কার্তিক ১৩৩৫।
৩৯ মো. রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, ১৫৬।
৪০ *সওগাত*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; আশ্বিন, ১৩৩৫।
৪১ *Bengal Legislative Council Proceedings,* V. 30, No. 1, 13th Session, 31 July-11 August 1928.
৪২ *ঢাকা প্রকাশ*, ১৯ আগস্ট ১৯২৮।
৪৩ *ঐ*, ২৬ আগস্ট ১৯২৮।
৪৪ *সওগাত*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; আশ্বিন, ১৩৩৫।
৪৫ *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ আগস্ট ১৯২৮।